ময়না বেগম চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। বললো—ভাইজান, সলু ছোট মিয়ারে নিয়া আইছে।

জলদি একজন ডাক্তার ডাক, তা না হলে ওরে বাঁচান যাবে না। রউফ পাশের বাড়ির ফয়েজকে উদ্দেশ্য করে বললো।

বড় মোল্লা বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করছে। বললো—রউফ, তুই আইছ।

সলু গাধাটা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে বাবা। ওদের তিন জনকে মেরেছে আর দু'জন কোন রকমে পালিয়ে গেছে। আবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো রউফ।

বড় মোল্লা কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে নামলো। বললো—ওরে, সলুর হাতটা একটু আমার হাতে দে।

বড় মোল্লা সোলায়মানের হাত ধরে বসে আছে। ফয়েজ সংবাদ আনলো, দুঃসংবাদ। ডাক্তার পাওয়া যায় নি তবে মিলিটারি আসছে।

সোলায়মানের শক্তি শেষ। এখনও রক্ত পড়েছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর মুখ, সমস্ত শরীর। কোন রকম দম ধরে বললো— ছোট চাচা, লড়াই করবা, কথা দাও। আমার মরণরে মিথ্যা অইতে দিও না। বলতে বলতে নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো সোলায়মানের মাথা।

ও রউফ, সলু হঠাৎ কথা থামাইলো ক্যান? বড় মোল্লা ভয় পাওয়া গলায় বললো।

বাজান, ও আর নাই। রউফের গলা কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে।

বড় মোল্লা বিমূঢ়। বসে রইলো কিছুক্ষণের জন্য, তারপর উঠে দাঁড়ালো। আবেগে তার কণ্ঠ কাঁপছে। বললো—মুক্তি বাহিনীগো সংবাদ দাও। মিলিটারি আইলে আমাগো জায়গা আমার ছাড়মু না, লড়াই করমু বীরের মতো, এই সলু গাধাটার মতো। বলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো বড় মোল্লা।

উপস্থিত তরুণদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। রেহান বললো—সলু পারছে, আমারও পারমু। চলো সবাই তৈয়ার হই। আমাগো যা আছে, ঐ দিয়াই চলবে। চলবে না?

রউফ উঠে দাঁড়ালো। বললো—অবশ্যই চলবে। আমাদের দেশ, আমাদের মাটি, যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ যুদ্ধ।

রউফ ভাই যতক্ষণ জান, ততক্ষণ যুদ্ধ চিৎকার করে বলে উঠল উপস্থিত অনেকেই।

রউফ গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখল, সম্মিলিত নির্ভীক দু'টো হাত প্রতিজ্ঞায় উঁচু হয়ে আছে ওরা সবাই।

ব্রাভো বাংলাদেশ

ড্রয়িং রুম এখন রীতিমতো সরগরম।

মামা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মামানি বেশ শান্ত স্বভাবের। বললেন—তোমরা এভাবে হইচই করলে খেলা দেখব কী করে?

দেখবে চোখ দিয়ে, শুনবে কান দিয়ে, মামা নির্বিকার ভাবে বললেন। বলেই আবার বসে পড়লেন। যেন জুত পাচ্ছেন না কোন ভাবে। মামা এবার পা নাড়াতে শুরু করলেন জোরে জোরে। এটা তিনি করেন বেশি আবেগ প্রবণ কিংবা উত্তেজিত হলে।

পা নাড়াতে নাড়াতেই বললেন—খেলা শুধু দেখতে হয় না, খেলায় খেলোয়াড়দের মতোই অংশ নিতে হয়।

মামানি বললেন—পা নাড়ান বন্ধ কর। এবার তোমার ষ্ট্রাকচার হবে। গত ওয়ার্ল্ড কাপে তো অল্পের উপর পার হয়েছিলে, ভাগ্যিস তখন বাংলাদেশ ছিলো না।

মামার পা নাড়ানোর গতি কমলো না। তিনি প্রমাণ করেছেন মানুষ অভ্যাসের দাস। আমি বলি শুধু দাস নয়, দাসানুদাস। তা না হলে মামার এ অবস্থা হয়? মামা তাঁর অভ্যাসের গোলামি অব্যাহত রেখেই বললেন—বাংলাদেশ থাকলে কী হতো?

মামানি খানিকটা বিরক্ত হলেন। বললেন—খবরের কাগজে সংবাদ শিরোনাম হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতো। এবারে কী কর, আমি তো ভয়তে ভয়তেই আছি?

হতে পারলে তো খুশিই হতাম, কিন্তু হব কী ভাবে? মামা টেলিভিশন থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন।

মামানি গম্ভীর। মামা বললেন—না, বাবা না। বাচ্চা নিয়ে সবুজ এই বাংলাদেশের মাটিতে আরো কিছুদিন হেসে খেলে বাঁচতে চাই।

মামানি মামার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন—তাহলে ঝাঁপাঝাঁপি বাদ দাও, বয়সের দিকে খেয়াল রেখে শান্ত হয়ে খেলা দেখ।

মামা এতোক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়ে সোফায় বসলেন। হাসান ব্যাটিং করছে। কোন রকমে ঠেলে উইকেট রক্ষা করেছে সে। সবুজ জার্সিতে তার ঘর্মাক্ত মুখে সংকল্পের ছাপ।

মামা হাঁকলেন—হাসান পিটা, আরে বাবা বুকে সাহস রাখ। সাদা চামড়া দেখে ঘাবড়ে যাসনে।

ভাবি এতোক্ষণে পিয়াজ আর কুচি কুচি করে কাটা কাঁচা মরিচের সাথে গরম গরম তেলেভাজা মচমচে মুড়ি এনে টেবিলের উপর রাখলেন।

বললেন—মামা খাওয়া শুরু করেন, চা দিচ্ছি।

তিনি ভিতরের দিক মুখ করে ডাকলেন—ফজলু, এই ফজলু।

জে আম্মা।

চায়ের পানি বসা— ভাবি বললেন কণ্ঠস্বর কিছুটা উঁচু করে।

ফজলুর বয়স চৌদ্দ। গত বছর পাঁচেক হলো এ বাসায় আছে। ভাবি ওকে রান্নাঘরে তরকারিটা নাড়তে বলে ড্রয়িং রুমে এসেছেন।

বৌমা, ফয়েজ আসেনি এখনো? মামা এতোক্ষণে স্বাভাবিক মুডে কথা বললেন।

না মামা। বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিভি দেখতে লাগলেন ভাবি।

গাধাটা চিরকালই মজার সময়টা মিস করে। মামা স্বগতোক্তি করলেন।

হাসান ততক্ষণে আক্রমণাত্মক বোলিং এর আর একটা বল কোন রকমে ঠেকিয়েছে, কোন রান হয়নি।

বিরস বদনে বসে রইলেন মামা। টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন যেন ক্ষুধার্থ কোন মাছরাঙা ডোবার কাছে বেঁকে আসা ডালের উপর বসে প্রহর গুনছে, কখন একটা মাছ দেখা যাবে। আর ঝোপ বুঝে মারবে এক মস্ত ছোঁ।

তোমার আবার কী হলো? প্রশ্ন করে মামানি তাকালেন মামার দিকে।

কি আর হবে ! ভরসা মাত্র হাসান, তাও কিনা বল পিটাবার সময় খালি ঠ্যাকায় আর ঝিমায়। মামার কণ্ঠে হতাশা।

বেচারা জান দিয়ে খেলছে আর তুমি বলছো ঝিমায়। মামানি অবাক!

মামার কণ্ঠে উষ্মা। বললেন—দেখলে, দেখলে রেশমা। একটা মেইডেন ওভার গেলো বাংলাদেশের। নাহ! হবে না! বলে মামা হাত পা ছেড়ে সোফায় এলিয়ে রইলেন।

হয়েছে, এবার মুড়ি খাও। মামানির কণ্ঠে কিছুটা তিরস্কার। মামা হাত বাড়িয়ে এক মুঠা মুড়ি নিলেন। তারপর মুখে পুরে চিবাতে শুরু করলেন। মামার দেখাদেখি এখন অনেকে মুড়ি খাচ্ছে। একটা হালকা সড় সড়, গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে চারদিকে। খাবার সময় মানুষের টেনশন কম থাকে। মামাকে দেখলে তাই মনে হয়। কারণ তিনি টিভি ছাড়াও মুড়ির থালার দিকে মাঝে মধ্যে নজর দিচ্ছেন।

ফজলু আবার এসে গ্যাঁট হয়ে বসলো সবার সামনে, খালি মেঝেতে।

ওরে ফজলু, একটু সরে বস বাবা, দেখতে পাচ্ছি না। মুড়ি চিবাতে চিবাতে বললেন মামা।

ফজলু ছেচড়ে ছেচড়ে খানিকটা সরল।

ভাবি এরই মধ্যে দু'তিনবার রান্নাঘর আর ড্রয়িং রুম করলেন। দু'বার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন । বললেন—আবার খেলা দেখতে মশগুল না হয়ে যায় তোর ভাইয়া।

একটু পরেই ফয়েজ ভাইয়া হন্তদন্ত ঘরে ঢুকলেন। হাতে একটা মস্ত বড় ইলিশ আর একটা ব্যাগে সব্জি। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মামাকে বললেন—মামা, তোমার

ইলিশ মাছের জন্য আমার খেলা দেখা গোল্লায় যেতে বসেছে। সেই কতক্ষণ আগে এক দোকানে দেখলাম ২২ রান। রিক্সাওয়ালা আসতে চায় না। জোরে জোরে চালাবার জন্য দু'টাকা বকশিশ। আচ্ছা, এখন বাংলাদেশের স্কোর কত?

মামা এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে বললেন—সাতাশ। তবে তুই থাকলে রান রেট বাড়বে। আমি জানি।

ভাবির মুখে এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে। ভাইয়া ফিরে আসায় তাঁকে খুশি খুশি লাগছে। ফজলু বাজারের ব্যাগ নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়লো।

ভাবিজান, মাছ কি অহনই রান্ধন লাগবো? মনে হলো ফজলু যেতে চাইছে না।

যা যা, মাছটা কুটে ফেল। মামার যত্ন আগে, তারপর খেলা। ভাবি ফজলুকে তাড়া দিলেন।

ফজলু মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভিতরে গেলো। ভাবি এবার ধূমায়িত চা এনে সবার সামনে রাখালেন।

ভাইয়া এখনও দাঁড়িয়ে। মামা সরে সোফায় এক কোণে তাঁর জন্য খানিকটা জায়গা করে দিয়ে বললেন—বস, এখানে।

ভাইয়া বললেন—মামা, বাংলাদেশের তো কুফা চলছে। ভাবছি বসব না দাঁড়িয়ে থাকব, না.....কি। ভাবিকে বললো—আমাকে একটা বালিশ দেবে, শুয়ে থাকি।

মামা অবাক!

বললেন—সে কিরে?

ভাইয়া নির্বিকার। বললেন—বাংলাদেশের লাক ফিরাব। তবে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে কোন অবস্থায় কাজ হয়।

হাসান এরই মধ্যে এক রান নিলো। মেরেছিলো জোরে। কিন্তু সাদাদের ফিল্ডিং জব্বর কড়া। লম্বা দৌড়ে বলকে হারিয়ে ধরেই ফিরিয়ে দিল স্ট্যাম্পের দিকে। কাজেই মাত্র এক রান।

মামা নড়ে চড়ে বললেন—ও ভাবে বাংলাদেশের লাক ফিরাতে পারবি, সত্যি বলছিস? দেখ না তা হলে ট্রাই করে।

মামার কণ্ঠে আশ্বাস পাবার আকুতি পরিষ্কার।

মাথা চুলকালেন ভাইয়া। বললেন—আমাকে দিয়ে হবে কিনা জানি না। তবে তোমার টুম্পাকে দিয়ে হতে পারে।

মামা সোফায় সোজা হয়ে বসলনে। হাসান এই মাত্র ভাল মার দিয়েছে। কিন্তু না আবার বলটা লুফে নিয়েছে একজন ফিল্ডার। হাসান রান নেবার চেষ্টা করে পুনরায় মাঝপথ থেকে ফেরত গেলো। কোন রকমে উইকেটটা বাঁচলো।

টুম্পা, এদিকে আয়। ভাইয়া হাঁকালেন।

টুম্পা ক্লাস সেভেনে পড়ে। মামার একমাত্র মেয়ে। তবে ও তেমন খেলা খেলা করে পাগল হয় না। ঘরের মধ্যে বসে পত্রিকা পড়ছিলো একা একা। খবরের কাগজ হাতে হাসতে হাসতে বের হয়ে এলো।

ভাইয়া, এখানটা পড়ে দেখ। পত্রিকা এগিয়ে দিলো টুম্পা।

ভাইয়া বললেন—তুই এইখানে সোফায় বসবি পাঁচ মিনিট, তারপরও বাংলাদেশ ভাল স্কোর না করলে শুবি পাঁচ মিনিট, তাতেও ভাগ্যের পরিবর্তন না হলে টেলিভিশনের সামনে আগুপিছু করে হাঁটবি। আমরা ডেফিনেটলি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবো।

টুম্পা অবাক। বললো—ভাইয়া, আলতু ফালতু কিছু খাওনি তো! যা উল্টা পাল্টা কথা বলছো না।

ভাইয়া গম্ভীর। তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—হুমায়ূন আহমেদের মেয়েটা নিশ্চয়ই দু'বোনের অত্যাচারে ভেগেছে, তা না হলে আজ আমাদের এ দুরাবস্থা হয়!

মামানি এতোক্ষণে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—এতো নামি দামি লোকের মেয়ে বোনদের অত্যাচারে ভেগেছে, কই কোথাও তো চোখে পড়ল না। এমন কিছু ঘটলে অবশ্যই পেপারে আসতো।

মামানি, তোমার চোখ খারাপ। পেপারে এসেছে, তুমি দেখনি। হুমায়ূন আহমেদ নিজে লিখেছেন বাংলাদেশের স্কোর খারাপ হলে তার ছোট মেয়েকে অন্য দু'বোন মিলে চেপে শুইয়ে রাখে, তা হলেই বাংলাদেশ ভাল স্কোর করে। সে বসে থাকলে কিংবা হাঁটলে বাংলাদেশের স্কোর খারাপ হয়। নিশ্চয়ই দু'বোনের ভয়েতে বেচারি আজ ভেগেছে কোথাও। ভাইয়া একবার টেলিভিশন আর একবার মামানির মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা ফর্দ তুলে ধরলো। পাঁচ মিনিট পার হলো। বাংলাদেশের রান রেটের কোন পরিবর্তন নেই।

এবার হাঁট পাঁচ মিনিট। ভাইয়া টুম্পাকে বললো।

পাঁচ মিনিট পর আমাকে কী করতে হবে? টুম্পা ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো।

কেন, শুয়ে যাবি ফ্লোরে।

গোল্লায় যাক তোমার স্কোর, বলে টুম্পা জোর কদমে ভাগলো।

এইমাত্র হাসান খিচে মেরেছে বলে, সোজা বাউন্ডারি পার। ভাইয়া চিৎকার করে বললো—সাবাস টুম্পা। আর একবার দে দৌড়, ফিরেছে কপাল।

ঠিক ঠিকই হাসান আরো একবার কড়া ব্যাট হ্যাঁকালো। দেখতে দেখতে আরও দুই রান।

আমাদের কালো চশমা কই? ভাইয়া মামাকে জিজ্ঞেস করলো।

আউট। মামার নির্বিকার জবাব।

মামানি ভাইয়ার হাত থেকে নিয়ে এতক্ষণ পেপার পড়ছিলেন। ভাইয়াও সোফায় বসে মুড়ির সাথে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

মামানি হঠাৎ সুর করে উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।

মামা তিরস্কারের ভঙ্গিতে মামনিকে বললেন—কবে থেকে আবার যোদ্ধা হলে? পুথি পড়া শুরু করলে নাকি?

আমি না, আমাদের সবার প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ। মামানি হাসতে হাসতে বললেন।

তোমার মতো নিরস মহিলাকে যিনি সরস করতে পারেন তাঁকে সালাম। মামা হাসলেন।

পড়েই দেখ না কি লিখেছেন তিনি। মামানির হাসি থামলো না।

তুমিই পড়ে শোনাও দেখি। কান তোমার দিকে আর চোখ খেলার দিকে।

মামানি খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে পড় শুরু করলেন, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী। সাবাস হুমায়ূন, সালাম তোমাকে আর তোমার অকপট সাহসী সমালোচনাকে।

মামা হুঙ্কার ছাড়লেন জোরে। সাবাস, জোরে হাঁকাও।

মামানি হঠাৎ ভড়কে গেলেন। বললেন— জোরেই তো পড়ছি।

মামা আবার হাঁকালেন জোরে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—তোমাকে না, বাঘের বাচ্চাদের জোরে ছুটতে বলছি। টুম্পা কইরে?

এসে আমাকে দেখেই আবার ভেগেছে। তবে খেয়াল করেছ মামা, ওর আসা যাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ভাগ্যে আরো দু'টো রান। ভাইয়া এবার দিলেন।

আমাকে শেষ করতে দিলো না। মামানির কণ্ঠে অভিমান।

মামা সুড়ুত করে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন—আগে বাড়।

মামানি এবার গোস্বা করে পত্রিকা ফেলে দিয়ে বললেন—আগে চিল্লাচিল্লি ছাড়।

মামা হা হা করে হাসলেন । বললেন—ওহে সহধর্মিনী, আমার প্রিয় সহধর্মিনী। তুমি কবিতার ছন্দে ছন্দে এগিয়ে চলো।

এতোক্ষণে টেলিভিশনে এক ওভারের শেষ। রিপ্লে করে দেখাচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের সাহসী যোদ্ধারা ছুটতে ছুটতে রান আউট ঠেকাচ্ছে।

মামানি জোরে জোরে শুরু করলেন—ইনশাল্লাহ, এই টেনশনই তাদের কাল হবে।

হাসান ছুটতে ছুটতে ব্যাট নিয়ে সাদা লাইন পার হলো। ও দিকে প্রতিপক্ষ স্ট্যাম্প ভেঙে ফেলেছে দ্রুত ক্ষিপ্রতায়।

সর্বনাশ, এই বুঝি কুফা লাগলো আবার! হায় হায়, রান আউট না হয়ে যায়। মামা রীতিমতো আঁতকে উঠলেন।

মামানি চোখ রাঙালেন। বললেন—এক নম্বর, পড়ার মধ্যে ফের বাগড়া দেবে না। দ্বিতীয়ত! হুমায়ূন আহমেদ অস্ট্রেলিয়াকে বলেছেন।

মামা হঠাৎ চপাং চপাং করে শব্দ করলেন। বললেন—বারো কোটি লোকের চুমো আর আদর আপনার জন্য, এখন আল্লাহ দয়া করে শুনলে হয়। বেঁচে থাকেন আরো কিছুক্ষণ, ব্যাট হাতে।

টেলিভিশনে সবুজ বাতি জ্বললো। মামা হা.....হা.....হা হা করে হাসলেন। বললেন—বাঙাল আদমি কভি নেহি হারে গা।

মামার এই এক মুদ্রাদোষ। উত্তেজিত হলে কখন কোন ভাষা ব্যবহার করবেন বলা মুশকিল। মামানি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছেন। দাঁড়িয়েই জোরে জোরে কিশোরীদের মতো হাত পা নাড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে পড়া শুরু করলেন, অস্ট্রেলিয়ানরা তাচ্ছিল্য করতে ভালবাসে, এই তাচ্ছিল্যর খেলাই তাদের কাল হবে। আমাদের নামি-দামি

ব্যাটসম্যানরাও হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু'একটা রান করবেন। আকরাম সাহেব কিছুই করবেন না তা তো হয় না! কিছু নিশ্চয়ই করবেন।

মামা জোরে জোরে হাঁকলেন। অবশ্য করবেন, গগল্‌স পরে খেলবেন, ডাইভ দিয়ে বল ধরবেন। বেশি কষ্ট হলে হাঁসফাঁস করবেন।

মামানি হাঁকালেন—শাট আপ, পিনড্রপ সাইলেন্স, নো ডিস্টারবেঞ্চ।

মামা ভড়কে থেমে গেলেন। তাকালেন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মামানির দিকে। সত্যি সত্যিই ঘরে সবার সোরগোল কমে এলো। টেলিভিশনে তখন বোলার আর ব্যাটসম্যানদের প্রস্তুতি চলছে।

মামানি আবারও শুরু করলেন—আমি বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের কোন কর্তাব্যক্তি হলে আকরাম সাহেবকে ডেকে বলতাম—ভাই আপনি দয়া করে চোখের কালো চশমাটা খোলেন। মুখের চুইনংগাম ফেলে দিয়ে মন লাগিয়ে খেলেন। জুনিয়র ব্যাটসম্যানদের উপদেশ দিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি মাঠ থেকে বল কুড়াতে গেলে ভুঁড়িতে চাপ পড়ছে। একটু কষ্ট তো করতেই হবে। আমি কি রূঢ় কথা বলে ফেলেছি? হ্যা বলেছি। আকরাম সাহেব যদি অস্ট্রেলিয়ার সাথে তেমন কিছু করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাবো। এবং পরবর্তিতে আন্তর্জাতিক খেলায় তাকে দলে না নেয়া হলে হৈ চৈ করবো। বাংলাদেশের মানুষ খারাপ টা মনে রাখে না। দ্রুত ভুলে যায়।

ভাইয়া এতোক্ষণে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন—কথাটা ঠিক।

ভাইয়া আর মামা পাশাপাশি বসে। মামার পরনে হাওয়াই শার্ট। হাসান ব্র্যাড্রের শক্তি দিয়ে বল পিটিয়েছে। ছুটছে বল উইকেট কিপারকে পরাস্ত করে। দু'টো ড্রপ খেয়ে বাউন্ডারির কাছাকাছি। ফিল্ডার লম্বা পায়ে চিতার ক্ষিপ্রতায় ছুটছে। না পরাস্ত হলো। এখন সে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। বল বাউন্ডারি পার। মামানি ডান হাতে পেপার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলা উপভোগ করছেন।

মামা হঠাৎ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে সটান উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাভো বাংলাদেশ! কোন দিকে মামার খেয়াল নেই। দু'হাত উপরে তুলে নাদুস নুদুস পেট কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলছেন, ব্রাভো বাংলাদেশ! ব্রাভো বাংলাদেশ!

আমিও আস্তে আস্তে মামার সাথে হাততালি দিলাম, ব্রাভো বাংলাদেশ! ব্রাভো বাংলাদেশ!

এই লেখাটি লাখো বাঙালি ক্রিকেট অনুরাগদের জন্য উৎসর্গীকৃত। এটি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পাকিস্তানি দলের বিরুদ্ধে স্মরণীয় (বিজয়ের আগের দিনের লেখা।

দাদা

দাদা ডাব খাব।

ভর দুপুরে?

দু'টো ডাব পেড়ে দাও না, দাদা। রাহেলা আবদারের সুরে বললো।

তোর পেটে কি রাক্ষস ঢুকছে? দুপুর বেলা এখন তো ভাত খাবি, যা ভাত খা গিয়া। ঘরে রান্না অয় নাই?

দাদার কণ্ঠে সামান্য তিরস্কার।

রান্না হবে না কেন? দাদা, ভাত আর ডাব কী এক হলো? গ্রামে আসিই বা বছরে ক'বার।

হ তা এই দুপুরে আমারে গাছে উডাবি?

এলাকায় শিকদার দাদা নামে পরিচিত। তিনি পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়। তেমন কিছু করেন না। তবে অমায়িক, বাবা-মা হারাবার পর সংসারের হাল ধরে আছেন শক্ত করে। শুধু নিজেদেরই নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের কোন অনুরোধও সাধ্যে থাকলে তিনি রাখেন। ছোট বোন রাহেলার স্বামী শহরবাসী। ভাল চাকরি করে। কাজেই ওরা বাড়িতে এলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবারেও এসেছে দিন তিনেক হলো।

বাচ্চু রাহেলার স্বামী। সে মনে করে প্রত্যেক শীতে গ্রামে এসে দিন দশেক না থাকলে গ্রামের সাথে দিলের টান কমে যায়। কথাটা একদম বেহুদাও বলেনি সে। দাদা সে কথা সমর্থন করেন। বলেন, বাচ্চু মিয়া খাঁটি কথা কইছ, তোমরা আইবা, যখন খুশি চইল্লা আইবা।

শীতের দিনে পথঘাট শুকনো, আর তাছাড়া বোনাস হলো, পায়েস? রসের হরেক রকম পিঠা আর কুয়াশা ভাঙা ভোরে মিঠা মিঠা রোদে সবাই মিলে রোদ পোহানো।

তবে ঘরে ভাবি থাকলে আরো ভাল হতো—বলে বাচ্চু হাসে। দাদার সমর্থনের জন্যে, তাঁর দিকে তাকায়।

দাদাও মুচকি হাসেন। বলেন—কইছ ঠিকই, তয় কামডা এহন অইব না। আরো কিছুডা সময় লাগবো।

হ্যাঁ, ওরা আসে প্রত্যেক শীতে, আসে শীতের পাখির মতো কিছু দিনের জন্য। এ বড় পরিবারে বাচ্চুরা একটা ছোট হিস্যা মাত্র। আসে বাদল ও পান্না। ওরা দাদার চাচাত ভাইবোন। চাকরির কারণে ওরা দেশে আসার সুযোগ পায় কম। তবে আসে